আমি স্বামীজী বলছি...

শিবপ্রসাদ রায়

আমি স্বামীজী বলছি...

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী

কার্যালয়
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

।। সত্ত্ব সংরক্ষিত ।।

দাম ঃ ৮.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

স্বামীজী বলছি

হে আমার ভারতের ভাই ও বোনেরা, তোরা আমার চিকাগোয় দেওয়া বক্তৃতার শতবার্ষিকী পালন করছিস দেখে আনন্দ হচ্ছে। সেই সঙ্গে সংশয়ও হচ্ছে। কারণ শ্রদ্ধা থাক্ না থাক্ বাপের শ্রাদ্ধ করার মত সব কিছুরই শতবার্ষিকী করা তোদের এখন একটি মজার উপকরণ। একটা হুজুগ। এখন কিন্তু যুগ পরিবর্তন হচ্ছে। ঝড় উঠেছে সর্বত্র। সব ওলোট পালট হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে সত্যকে আঁকড়ে ধরার উপযুক্ত সময়। আমেরিকায় আমার মিশন সাকসেসফুল। তারা আমার কথা ধরতে পেরেছে। আমার ভাবনা তোদের নিয়ে। বুদ্ধির জগতে এতো বিকৃতি ভারতবর্ষে এর আগে দেখা যায় নি। আমাদের সব কথার মানে করছিস নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে। আমার গুরু বললেন ঃ জীবে দয়া করো। তোরা ধরে নিলি জিভে দয়া করো। স্বাস্থ্যহীন বাঙালির রান্নাঘরে যা। দেখবি সব পরিশ্রমের লক্ষ্য শুধু রসনাতৃপ্তি। স্বাস্থ্যরক্ষা নয়। আমি চিকাগোয় গেলাম হিন্দুধর্মের বিজয় ঘোষণা করতে। তোরা এখন খুঁজে বার করছিস কোথায় কবে মুসলমানদের দু'লাইন প্রশংসা করেছি, এক লাইন ভাল বলেছি খৃষ্টানদের। তাই দিয়ে আমার মূল্যায়ন করছিস। একটা মানুষ কোন্ পরিস্থিতিতে কোথায় কি বলল তাই দিয়ে তার মূল্যায়ন হয় না। মূল্যায়ন করতে হয় তার সারাজীবনের চিন্তা এবং কর্মকে সামনে রেখে। যেটা করতে পেরেছে মুসলমানেরা খৃষ্টানেরা। খৃষ্টানেরা আমাকে হিন্দু সন্ন্যাসী হিসাবে গ্রহণ করেছে। মুসলমানেরা কোন দেশে আমাকে পাত্তা দেয়নি। তারা তোদের মত দেউলে বুদ্ধি হয়ে যায়নি। তারা কোদালকে কোদাল বলেছে। খনিত্র বলে গোলমাল পাকাচ্ছিস শুধু তোরা। তাই তোদের বলছি আমার সমগ্র রচনাবলী পড়। একশো বছর পরে আবার আমার চিকাগোয়

দেওয়া ভাষণ শোন্। যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে। ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বললাম ঃ হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী এবং ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা আমাকে যে আন্তরিক এবং সাদর অভ্যর্থনা করেছেন তার উত্তর দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবধর্মের প্রসূতি স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তার প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দু জাতির এবং সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর পক্ষ থেকে আমি আজ আপনাদের হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যাঁরা অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধি রূপে এখানে এসেছেন তাঁরা পরধর্ম সহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের দাবী করতে পারেন মাত্র। কিন্তু যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন এবং সব রকমের মতকে গ্রহণের শিক্ষা দিয়ে এসেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে অন্য ধর্মকে কোনো মতে সহ্য করি এমন নয়। সকল ধর্মেই সত্য আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে 'হেয়' বা 'পরিত্যাজ্য' অর্থবহ কোন শব্দই নেই, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়ে এসেছে আমি সেই হিন্দু জাতির আন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি। আমি আপনাদের বলতে বেশ গর্ববোধ করছি যে, যে বছর রোমানদের ভয়ংকর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির দেবালয়গুলো চূর্ণ হয় তারা পালিয়ে যায়। আমরা তাদের দক্ষিণ ভারতে সাদরে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। জরথুস্ত্রের অনুগামী বিরাট পারসিক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয় দিয়েছে এবং যে ধর্ম আজও তাদের প্রতিপালন করে চলেছে আমি সেই ধর্মের একজন। তাই আমি হিন্দু বলতে গৌরববোধ করি। কোটি কোটি হিন্দু নরনারী যে শ্লোকটি নিত্য পাঠ করেন আমি বাল্যকাল থেকে যা আবৃত্তি করে আসছি তার অর্থটা আপনাদের শোনাচ্ছি। হে প্রভু, ভিন্ন ভিন্ন

পথে গিয়েও সব নদী যেমন একই সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়, প্রত্যেকের ভিন্ন রুচিহেতু বিরল ও কুটিল নানা পথগামীদের তুমিই সেইরকম একমাত্র গম্যস্থান। এই মহাধর্ম সম্মেলনে গীতাপ্রচারিত সেই চিরসত্যের আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যার সহজ মানে ঃ যে যেরকম মত আশ্রয় করেই আসুক না কেন আমি তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জ্জুন মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার নির্দ্দিষ্ট পথেই চলে থাকে। সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা এবং তার ভয়াবহ ফলাফল ধর্মোন্নত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জগতে এরা মহাউপদ্রব উৎপন্ন করেছে। মানুষের রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে সভ্যতা ধ্বংস করেছে মাঝে মাঝে সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এইসব ভীষণ পিশাচগুলো না থাকলে মানুষের সমাজ আজ যেখানে পৌঁছেচে তার চেয়ে কত উন্নত হতে পারত। আমি সর্বতোভাবে আশা করছি এই সর্বনাশা ধর্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যুকাল উপস্থিত। মহাধর্মসম্মেলনে আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হলো তাতে সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা নির্য্যাতনপরম্পরা এবং অসদ্ভাবের অবসান ঘটাবে।

এই ছিল আমার প্রথম দিনের বক্তব্য। আর একদিন বললাম ঃ হিন্দুধর্ম প্রকৃতির মত। বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সংঘাত থাকে না। ঈশ্বর নিজে বৈচিত্র্য পিয়াসী। চারশো কোটি মানুষের সাদৃশ্য নেই। কিছু তফাৎ থাকবেই। বুড়ো আঙুলের ছাপেও পার্থক্য থাকবে। চারটে নারকেল গাছ পুঁতলে উচ্চতা আয়তন ফলে জলে শাঁসে বৈচিত্র্য থাকবেই কিন্তু বড়ো গাছটা ছোটো গাছটাকে গুঁতোবে না। ছোটো গাছটা ভয়ে সংকোচে গুটিয়ে থাকবে না। নির্ভয়ে শান্তিতে বাস করবে পাশাপাশি। কেটে ছেঁটে দুটোকে সমান করতে গেলেই অশান্তি বিরোধ। বহুত্বের মধ্যে একত্ব এটা জগতের প্রকৃতির নিয়ম। এটা একমাত্র হিন্দুরাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতবাদকে বিধিবদ্ধ করে সমগ্র সমাজকে গায়ের জোরে সেগুলো মানতে বাধ্য করে। সকলের সামনে তারা একই মাপের জামা রেখে

দেয়। জ্যাক জন জয়নাল সবাইকে এক মাপের জামা পরতে হবে। যদি গায়ে না লাগে তাহলে তাকে খালি গায়েই থাকতে হবে। এখানেই আমাদের মানে হিন্দুদের বিরাটত্ব। হিন্দুরা আগেই আবিষ্কার করেছেন; আপেক্ষিককে আশ্রয় করেই নিরপেক্ষ পরমতত্ত্ব চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব। তাই তারা মূর্তি পূজো করেও এতো উদার সহিষ্ণু পরমতশ্রদ্ধাশীল। তোমরা যা মনে করো মূর্তি পূজা একটা ভয়ানক ব্যাপার তা নয়। মূর্তিপূজা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়। বরং এটা দুর্বল অধিকারীকে ধর্মের উচ্চ ভাবকে ধারণা করতে সাহায্য করে। হিন্দুদের অনেক দোষ আছে কিন্তু তাদের সবদোষ আত্মদেহপীড়নেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য ধর্মের লোকেদের শিরশ্ছেদনে আগ্রহী করে না। হিন্দু নরনারীদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মোন্মাদ হয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিজের দেহকে পুড়িয়ে দেয় কিন্তু তার কখনও বিধর্মী বিনাশের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে না। অতএব হিন্দুর পক্ষে সকল মানুষকে আত্মীয় মনে করা একটা অতি সহজ ব্যাপার। পৃথিবীর নানা রুচি বিশিষ্ট মানুষদের নানা অবস্থা এবং পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সেই একই পরম লক্ষ্যে পৌছবার জন্য হিন্দুত্বের মূল সুরটি অনুভব করা দরকার। ভারতের ধর্মীয় উত্থানপতন দেখে ভবিষ্যত পৃথিবীর অবস্থা কল্পনা করা যায়। হিন্দু, জরথুষ্ট্র এবং ইহুদী এই তিনটে ধর্ম প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এই ধর্মগুলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়েও জীবিত। একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এতে প্রমাণিত হচ্ছে এদের মধ্যে কিছু মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে ইহুদী ধর্ম তৎপ্রসূত খৃস্ট ধর্মকে আত্মসাৎ করতে পারা তো দূরের কথা তার নিজেরই সর্ববিজয়িনী কন্যার দ্বারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আর ইসলামের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে জন্মভূমি থেকে বহুদূরে ভারতবর্ষে অল্পসংখ্যক পারসিক সেই মহান জরাথুষ্ট্র ধর্মের সাক্ষী স্বরূপ রয়ে গেছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উঠে এসেছে হিন্দুধর্ম থেকে। মনে হয়েছে বেদোক্ত হিন্দুধর্মের ভিত্তিই বোধ

হয় এরা নাড়িয়ে দিল। কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন খানিকটা পশ্চাৎপদ হয়ে সহস্রগুণ প্রবলবেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরে আসে, ঠিক সেই রকম এদের জননী স্বরূপ বেদোক্ত ধর্ম প্রথমে একটু পিছু হটে বিপ্লবের কোলাহল অবসানে সেই সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করে নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করেছে। এই হচ্ছে সনাতন বা চিরায়ত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি যেমন সবকিছুকে নিজের মত করে নিয়ে গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম ও তাই। বিদ্বান মানুষেরা জানেন বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কার সমূহ বেদান্তের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনিমাত্র। সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান থেকে মূর্ত্তিপূজা, আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরণিক গল্প থেকে বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ জৈনদের নিরীশ্বরবাদ সবের স্থান আছে হিন্দুধর্মে। প্রশ্ন উঠতে পারে পৃথিবীতে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দুটি অংশ যেখানে প্রাণঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয় সেখানে হিন্দুধর্ম এই সকল বিভিন্ন আপাতবিরোধী ভাবগুলি কিসের ভিত্তিতে সামঞ্জস্যবিধান করতে পেরেছে? আমি এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করব।

আপ্তবাক্য বেদ থেকেই হিন্দুরা তাদের ধর্মলাভ করেছে। তারা বেদসমূহকে অনাদি অনন্ত বলে মনে করে। একটা গ্রন্থকে অনাদি অনন্ত বললে শ্রোতাদের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু “বেদ” শব্দে কোন পুস্তক বিশেষ বোঝায়না। বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন বেদ সেইসব উপলব্ধির সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ। আবিষ্কৃত হবার আগেও যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী বিদ্যমান ছিল এবং সমস্ত মানবসমাজ যদি ওগুলো ভুলে যায় তাহলেও তা যেমন বিদ্যামান থাকবে আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মের ক্ষেত্রেও একই কথা। আত্মার সঙ্গে আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হবার আগেও এগুলি ছিল, সকলে বিস্মৃত হলেও এগুলি থাকবে। এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কর্তাদের নাম ঋষি। আমরা

তাঁদের পূর্ণ বা মুক্ত বলে ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, যে অত্যন্ত উন্নত ঋষিকুলের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে ওইসব আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাদের আদি আছে। বেদের বক্তব্য সৃষ্টি অনাদি অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা যদি এমন এক সময় সম্ভব হয় যখন কিছুই ছিল না। তাহলে এই সব শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেউ বলতে পারেন যে এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহলে ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় কখনও সক্রিয় গতিশীল। অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। বিকারশীল পদার্থ মাত্রেই মিশ্র পদার্থ। মিশ্র পদার্থ মানেই ধ্বংসনাসক পরিবর্তনের অধীন। তাহলে ঈশ্বরের মৃত্যু হবে। এটা অসম্ভব। অতএব এমন সময় কখনও ছিল না যখন সৃষ্টি অনুপস্থিত। কাজেই সৃষ্টি অনাদি। যদি তুলনা দিয়ে বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এই দুটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তি স্বরূপ এবং নিত্য সক্রিয় বিধাতা তাঁরই নির্দ্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা থেকে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে কিছুকাল চলছে আবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুবালক গুরুর সঙ্গে প্রত্যেকদিন আবৃত্তি করে থাকে ঃ সূর্য্যাচন্দ্র সমো ধাতা যথাপূর্বসকল্পয়ৎ। অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব পূর্ব কল্পের সূর্য্য ও চন্দ্রের মত এই সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করছেন। এই চিন্তাধারা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। এই জ্ঞান এবং অনুভূতিই হিন্দু সমাজের সকলকে ধরে রেখেছে এবং এই ভাবনাই মনুষ্যসমাজকে সংঘর্ষহীন একটা অদৃশ্য শৃংখলে বেঁধে রাখতে পারে। এই আত্মা পরমাত্মার পরমতত্ত্ব হিন্দুদের অধীত বলেই তারা মানুষকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করেনি। আহ্বান করেছে অমৃতের পুত্র বলে। অমৃতের পুত্র — কি মধুর ও আশার নাম। হে ভ্রাতৃগণ এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুরা তোমাদের পাপী বলতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের

সন্তান। পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা। মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের ওপর মিথ্যা কলংক আরোপ। ওঠ এসো, সিংহ সদৃশ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষ তুল্য মনে করছ কেন? এই ভ্রম দুর করে দাও। তোমরা অমর আত্মা মুক্ত আত্মা চির আনন্দময়। তোমরা জড় নও দেহ নও। জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।

এইভাবে বেদ ঘোষণা করেছে, যে এই সৃষ্টি ব্যাপারটা কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর ভয়াবহ সমাবেশ নয় বা অনন্ত কার্য্য কারণের বন্ধনও নয়। এই সব নিয়মের উর্দ্ধে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রয়েছেন এক বিরাট পুরুষ। যাঁর আদেশে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে মেঘ বৃষ্টি দিচ্ছে এবং মৃত্যু ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। তাঁর স্বরূপ কি? তিনি সর্বব্যাপী শুদ্ধ নিরাকার সর্বশক্তিমান। সকলের প্রতিই তাঁর করুণা। তুমি আমাদের পিতা মাতা পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল। তুমি আমাদের শক্তি দাও। তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করে আছ। এই ক্ষুদ্রজীবনের ভারবহন করতে তুমি আমায় সাহায্য কর। বৈদিক ঋষিগণ এই গানই গেয়েছেন। আমরা তাঁকে পুজো করব কিভাবে? প্রীতি ভালবাসা দিয়ে? প্রেমাস্পদরূপে ঐহিক ও পারত্রিক সব প্রিয় বস্তুর চেয়ে প্রিয়তর রূপে তাঁকে পুজো করতে হবে। শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদের এই শিক্ষা। এখন দেখা যাক হিন্দুরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলে যাঁকে বিশ্বাস করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই প্রেমতত্ত্ব পরিপূর্ণ করে প্রচার করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ঃ মানুষ পদ্মপাতার মত সংসারে বাস করবে। পদ্মপাতা জলে থাকে কিন্তু তাতে জল লাগে না। মানুষ তেমনি সংসারে থাকবে। ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করে হাতে কাজ করে যাবে। বেদ শিক্ষা দেয় ঃ আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপ। কেবল জড় পঞ্চভূতে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই বন্ধনের শৃংখল চূর্ণ হলেই আত্মা পূর্ণতা উপলব্ধি করে। এই পরিত্রাণের অবস্থার নাম মুক্তি। সকল প্রকার অপূর্ণতা মৃত্যু ও দুঃখ থেকে মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপায় এই বন্ধন ঘুচে যেতে পারে আর পবিত্র হৃদয় মানুষের ওপরই তাঁর কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁর কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। কিভাবে তাঁর করুণা প্রকাশিত হয়? পবিত্র হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ হৃদয় মানুষ ইহজীবনেই তাঁর দর্শন লাভ করেন। তখনই, কেবল তখনই হৃদয়ের সব কুটিলতা চলে যায় সব সন্দেহ বিদূরিত হয়। মানুষ তখন আর ভয়ংকর কার্য্যকারণ নিয়মের ক্রীড়া কন্দুক নয়। এই হচ্ছে হিন্দুধর্মের মর্মস্থল, হিন্দুধর্মের প্রাণস্বরূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ আর শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকতে চায় না। সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরে যদি অতিন্দ্রীয় সত্তা বলে কিছু থাকে হিন্দু সাক্ষাৎভাবে তার সম্মুখীন হতে চায়। যদি তার মধ্যে আত্মা বলে কিছু থাকে যাহা আদৌ জড় নয়, যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন হিন্দু তার কাছে যাবে অবশ্যই তাঁকে দর্শন করবে। তবেই তার সকল সন্দেহ দূর হবে। অতএব আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে হিন্দুঋষি বলেছেন ঃ আমি আত্মাকে দর্শন করেছি ঈশ্বরকে দর্শন করেছি। সিদ্ধি বা পূর্ণত্বের এটাই একমাত্র নিদর্শন। কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়। অপরোক্ষ অনুভূতিই তার মূলমন্ত্র। শুধু বিশ্বাস করা নয় আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়া তাকে জীবনে পরিণত করাই ধর্ম। এইসব কথা আমি চিকাগোতে বলেছিলাম। এসব হচ্ছে মানবতার চেয়েও অনেক বড় কথা। বিশ্বভৌমিকতার কথা। এসব কথা অন্য ধর্মের লোকেরা জানেনা। শোনেওনি এর আগে। এই ধর্ম সারা বিশ্বে যদি ছড়িয়ে দিতে পারিস তবে সাম্প্রদায়িক হানহানি থামবে। শান্তি নেমে আসবে মাটির পৃথিবীতে। ঐক্যের চীৎকার সম্প্রীতির হুল্লোড় করে কিছু হবে না। কোথায় বিদ্বেষ আছে ধর্মান্ধতা আছে সেগুলো একটু খুঁজে দ্যাখ্ আর হিন্দুত্বের বইগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া কর। এতক্ষণ তো চিকাগো ভাষণের অনেকটাই শুনলি, তাতে কি মনে হচ্ছে? হিন্দুত্বের কোথাও তিলমাত্র ডগমা আছে? ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে হিন্দুত্ব হচ্ছে

জাতীয়তা। হিন্দুধর্ম হচ্ছে মানবসমাজের জন্য মৃতসঞ্জীবনী। বিশ্বভৌমিকতাবাদী একটি দর্শন। বুদ্ধির বিকারের ফলে তোরা মৌলবাদী ধর্মান্ধ সংকীর্ণ চিন্তাগুলির সঙ্গে হিন্দুত্বকে এক লাইনে বসিয়ে দিচ্ছিস। এটা যে কত বড় অন্যায় আর আমরা যারা গৌরবের সঙ্গে হিন্দুধর্মকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছি তাদের কি ভীষণ অপমান করা হচ্ছে তোদের বোঝার ক্ষমতাও নেই। শুধু এই ব্যাপারেই নয়, জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তোরা সামান্যতম শুভ্রতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিস। আমি বিশ্বের দেশে দেশে ভারতমায়ের মুখ উজ্জ্বল করে এলাম আর তোরা সেই উজ্জ্বল মুখে কালি মাখিয়ে দিচ্ছিস। তোদের চিন্তা চেতনা বিচারশক্তি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। তোদের প্রত্যেকের কি হাল হয়েছে বিবেকের আয়নাতে একবার দেখিসও না। এতদূরে বসেও আমার কিন্তু আর সহ্য হয় না। নিজেদের গলিত অবস্থাটা তোরা বুঝতে পারিস না, অনুভব করতে পারিস না। এ যে আমার কি যন্ত্রণা তোদের কেমন করে বোঝাব। অবস্থা দেখে আমার মনে হয় বার্ষ্ট করে যাই। আর একবার অগ্নিময় হয়ে তোদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ঝুঁটি ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দিই। ধাক্কা দিয়ে তোদের কাজে লাগাই। তার আগে মনে হয় গলা ফাটিয়ে আমার জ্বালা যন্ত্রণার কিছু কথা শ্লেষের সঙ্গে ধিক্কারের সঙ্গে সবাইকে বলি।

হ্যাঁ, অমি স্বামী বিবেকানন্দ বলছি। মল্লিকা ফল্লিকা নয়, সোজা তোদের বলছি। তোরা মানে, এই ভারতের কোটি কোটি মানুষ নামধারী কীটগুলোকে বলছি। বলার দরকার ছিল না। আর তোদের এখন যা মত্ত অবস্থা জানি, বলেও কিছু লাভ নেই। যখন তোদের ওখানে ছিলাম তখন দু'শো যুবককে আমি আহ্বান করে ছিলাম তোরা সাড়া দিসনি। মাদ্রাজের ছেলেদের সহযোগিতায় আমি যখন আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতায় বাজীমাৎ করে দিলাম, অমনি তোরা কবিতা লিখে ফেল্‌লি "বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী" ......ভাগ্যি তোদের ওখান থেকে ঊনচল্লিশ বছর বয়সেই পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম, আমিও বেঁচে

গেছি তোরাও বেঁচে গেছিস।

এতদিন তোদের ওখানে থাকলে আর কিছু বলার ইচ্ছা আমার থাকতো না। শুধু তোদের প্রত্যেককে ধরে ধরে চাবকাতাম, চাবকে পিঠের চাল ছাড়িয়ে দিতাম। তোরা ব্রহ্মময়ীর বেটা, তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, কোথায় তোরা জগৎ জয় করতে বেরোবি তা নয় শুধু হা অন্ন যো অন্ন করে ধুঁকছিস আর কোনরকমে দুটো কিছু দিয়ে পেটটা ভরাতে পারলেই ব্যাস অমনি সব কামনা বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ। হয় একটি মেয়ের পেছনে ঘুর ঘুর করবি নয়তো সিনেমা থিয়েটার কোথায় একটু সস্তা আনন্দ পাওয়া যায় সেখানে ছুটবি। আর মেয়েগুলোকেও বলিহারি দিই বাবা, সব যেন কামরূপ কামিক্ষ্যের মেয়ে। শুধু সেজেগুজে ছেলেগুলোকে ভোলাবে। নদীর ধারে, মাঠের কোণে বসে অবান্তর সব কথা বলে তাদের যেটুকু পৌরুষ আছে সব শেষ করে একটা ভেড়া বানিয়ে দেবে। আচ্ছা তোদের কি ইচ্ছা করে না ছেলেগুলো এক একটা বীর হোক, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ একাকার করে দিয়ে হর হর ব্যোম ব্যোম বলে জগৎটাকে চষে বেড়াক। সব অন্যায়, অবিচার, দুঃখ, দারিদ্র, অজ্ঞানতা লাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিক। বলি তোদের কি একবারও নিবেদিতার কথা মনে পড়ে না। গয়নার ডিজাইন কিম্বা ব্লাউজের ফ্যাসান নিয়ে তোরা যখন ব্যস্ত থাকিস তখন কি তোদের একবারও মনে পড়ে না, যে তোদের চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী একটা বিদেশী মেয়ে রুদ্রাক্ষের মালা পরে জীবনটা এই দেশের জন্য পাত করে দিল। পোড়ারমুখীরা, তার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একবার তোদের কামনামাখা রূপের একটু তুলনা করে দেখিস তো। করলে আর কি হবে, তোদের লজ্জা নেই, লজ্জাও পাবি না। অথচ তোরা, মানে মেয়েরাই হচ্ছিস শক্তি, আদ্যাশক্তি সনাতনী। আমরা যেখানে ভালো কিছু দেখি শ্রদ্ধার কিছু দেখি সেখানে মা বলে ভূষিত করি। মা আমাদের কাছে একটি পবিত্রতম শব্দ। মাতৃভাব হিন্দুজীবনে একটি উচ্চভাব। তাই আমরা গঙ্গাকে মা বলি, ভারতবর্ষকে মা বলি, জগৎ

জননী বলি। দেশের সাধু সন্ন্যসী বীর-যোদ্ধা-জ্ঞানী-গুণী সব তো তোদেরই গর্ভে জন্মেছে। অজেয়কে জয় করতে, অজানাকে জানতে, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে তোরাই উদ্বুদ্ধ করেছিস একদিন। ভারতবর্ষ দেশটা যে ত্যাগভূমি সে তো অনেকটা তোদের জন্যেই।

কিন্তু এখন তোদের সাজসজ্জা, চেহারা, পোষাক দেখলে মনে হয় উঠে পড়ে লেগে গেছিস গোটা পুরুষ জাতটাকে ত্যাগব্রতী নয় ভোগব্রতী করতে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ আদ্যশক্তি মহামায়া জগজ্জননীর কি লালসাময়ী রূপ। তোরাই বল তোরা একটু রাশ টেনে ধরলে দেশটার এই দশা হয়! কথাগুলো খুব কড়া হয়ে গেল। কিন্তু কি করি বল, তোদের যে ভীষণ ভালবাসি। সব সাধকের যে পরম কাম্য বস্তু গুরুদেবের ইচ্ছায় ত্যাগ করেছিলাম, সে তো তোদেরই জন্যে। তোদের অধঃপতন দেখে বড্ড কষ্ট হয়। জানিস ভারতবর্ষে জন্মে কেউ যদি পশুজীবন যাপন করে যায় তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই। এই দেশটাকে একটু জানতে চেষ্টা কর, দেখবি জীবনটাই পাল্টে যাবে।

নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাবি। আমার কথাই ধর না, তোদের চেয়ে কি এমন বেশী ছিলাম। কায়স্থ পরিবারের সন্তান, অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট। কিন্তু আমার চেষ্টা ছিল, অনুসন্ধান ছিল, পেয়ে গেলাম রামকৃষ্ণকে। চাকা ঘুরে গেল। তোরা আমার কথা শুনিসনি, বয়েই গেছে আমার। আমি নরেন থেকে বিবেকানন্দ হয়ে গেলাম। সন্ধ্যেবেলা আজও আমার মত হাজার নরেন তোরা হেদোয় বসে কি খুঁজিস? কিচ্ছু না। হাঁ করে সামনে তাকিয়ে থাকিস। কোন চেনা বন্ধু পেলে দুটো কথাবার্তা, তাও হা-হুতাশ, এটা পেলাম না, সেটা হলো না। আর খুঁজলে ছেঁদো ভালবাসার নামে একটু জৈবিক আত্মপ্রসাদ খুঁজিস। বল্ তোদের গালাগালি দেবো না তো কি আশীর্বাদ করবো? বছর বছর আড়ম্বর করে আমার জন্মদিন পালন করা হয়। বাড়ীতে ছবি টাঙ্গানো হয় আমার। আমার এতো লজ্জা করে কি বলব! আমার জীবনকে কেউ অনুসরণ করবি না, আমার আদর্শকে কেউ গ্রহণ করবি না, অথচ

আমাকে সামনে রেখে শুধু বড় বড় কথা। মা-বাপেরাও তেমনি ছেলে বীর হোক, সন্ন্যাসী হোক, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুক দশের জন্যে, দেশের জন্যে তা নয়, খালি বলবে ওসব আমাদের জন্য নয, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে সংসারের কর্তব্যটাই বড়। এইসব বলে বলে ছেলেগুলোকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর করে দিচ্ছে। আর তোরাও সব বাপের সুপুত্তুর, পছন্দ করে মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে বাপের সঙ্গে বিরোধ করতে পারিস, ঘর ছাড়তে পারিস, ঝুঁকি নিতে পারিস। কিন্তু একটা বড় আদর্শের জন্য মহৎ কিছুর জন্যে কিচ্ছু ছাড়তে পারিস না।

তোদেরই মতো একটা ছেলে আমার কথাবার্তা শুনে লেখাপত্তর পড়ে নিজের চেষ্টায় সুভাষ থেকে নেতাজী হয়ে গেল। আর তোরা! বছরে একবার তার জন্যে বুক চাপড়ে সব শেষ। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি এমন একটা সঞ্জীবনী, এর স্পর্শে মানুষ অমৃতময় হয়ে উঠতে পারে। তোদের হাতের কাছে অমৃতের নদী, আর তোরা একচুমুক খেয়ে দেখলি না।

আমি একচুমুক খেয়ে দুনিয়াটা দাপিয়ে বেড়ালাম। কোন পীর-গাজী-রেভারেণ্ড-কার্ডিন্যাল সামনে দাঁড়াতেই পারলে না। আমি বিশাল সমুদ্রের সংবাদ নিয়ে গেছি যা চিরায়ত হিন্দুত্বের অমৃত উৎস থেকে উৎকীর্ণ। ওরা সবাই এক একটা এঁদোপুকুরের প্রতিনিধি। আমার সামনে দাঁড়াবে সে বুকের পাটা কোথায়? আমি গেছি যুগ যুগান্তের ত্যাগ-তপস্যালব্ধ সত্যের উপলব্ধি নিয়ে। ওরা পেয়েছে প্রাণহীন কিছু অভ্যাস মাত্র। চিকাগোয় আমি যখন সকলের সামনে বুক টান করে বললাম ঃ 'ধর্মের নামে ইহুদীদের আপনারা তাড়িয়ে ছিলেন, পারসীকদের তাড়িয়েছিলেন, আমি সেই বিতাড়িত মানুষগুলোকে স্থান দেওয়া ধর্মের দেশ থেকে এসেছি। হিন্দুধর্ম সব ধর্মের জননীস্বরূপা। একদিন কূয়োর ব্যাঙের গল্প বললাম, যে কিছুতেই সমুদ্রের আন্দাজ করতে পারে না। এটা অন্য ধর্মের ক্ষুদ্রতাকে কটাক্ষ করা। সবাই বুঝলো, কিন্তু কেউ

প্রতিবাদের সাহস দেখালো না। আমি হিন্দুত্বকে জগৎসভায় প্রতিষ্ঠা করে এলাম। ঘাড় কাত করে দুনিয়ার ফাদার মৌলভীরা আমার বক্তব্যের সত্যতা মেনে নিলো। আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় আমার ছবি টাঙ্গিয়ে তলায় লিখল 'হিন্দু মংক অফ ইণ্ডিয়া''। আর তোরা বাঘের বাচ্চা থেকে মেষশাবক হয়ে গেলি। হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করতেও লজ্জা। তোদের কি বলব—এ দেশের সাধু সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরে বলছে আমরা হিন্দু নই। আমরই তৈরী করা প্রতিষ্ঠানের সাধুরা আদালতে দাঁড়িয়ে বলছে আমরা সংখ্যালঘু। এতোদিন বেঁচে থাকলে তো তোরাই আমাকে সাম্প্রদায়িক বলতিস। আর নইলে আমাকে আত্মহত্যা করিয়ে ছাড়তিস। আরে আহাম্মুক, হিন্দুর চেয়ে গৌরবজনক শব্দ, পবিত্র শব্দ, পৃথিবীতে দুটি নেই। হিন্দুর কাছে সবাই নিরাপদ। অন্যদের কাছে কেউ নিরাপদ নয়। জগতের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্ সব কাটাকাটি করে মরছে। সব অসহিষ্ণু। এদের রক্ষা করবে কে? হিন্দুত্ব। আর তোরা নিজেকে ভূলে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে একমুঠো গম একটু দুধের জন্য কেরেস্তান হ'য়ে যাচ্ছিস। কটা টাকার জন্য মোচোরমান হ'য়ে যাচ্ছিস। অথচ তোদের পূর্ব-পূরুষেরা কতো অত্যাচার সহ্য ক'রে কতো প্রলোভন জয় ক'রে কি প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিয়ে হিন্দু হিসাবে নিজেদের রক্ষা ক'রেছিল। ধর্মান্তরিত হয়েছিল কারা? ভীতু, লোভী, কামপরায়ণ, অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারেনি এইসব লোকেরা। এদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে লজ্জা করে না তোদের! আমি বললাম ধর্ম ছাড়লে তোদের বিনাশ নিশ্চয়। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। আগামী পঞ্চাশ বছর তোদের আরাধ্যা জননী হোক ভারতবর্ষ। একটা কথাও ধরতে পারলি না। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, ছোবড়া নিয়ে টানটানি ক'রছিস। মানুষের প্রতি প্রেম নেই, দেশের প্রতি ভালবাসা নেই, প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ধর্ম হ'চ্ছে, রাজনীতি হ'চ্ছে। তোদের রাজনীতি মানে মিথ্যাচার, হত্যা, চরিত্রহনন, সবরকম নোংরামীর চূড়ান্ত। আর ধর্ম মানে ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা

যায়, পিদিম দু'বার ঘুরবে না চারবার ঐ নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাচ্ছিস। তাই তোরা হচ্ছিস লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো জাত। একদিন দুটো কুকুরের কামড়া কামড়া দেখিয়ে ঠাকুর আমাকে বললেন, নরেন তুই কক্ষণো পণ্ডিত হবি না, ওই দেখ, পণ্ডিতদের ধর্ম। আলু বেগুনে ঠোকাঠুকি হ'য়ে গেলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে, সাতবার হাতে মাটি না দিলে চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে না চব্বিশ পুরুষ, এসব দূরূহ প্রশ্নের সমাধান ক'রছে আমাদের পণ্ডিতরা দু'হাজার বছর ধরে। আর জগতের লাথি খেয়ে যাচ্ছে মুখ বুজে। ধর্মের নামে নিজের সমাজে ছোট বড়ো বিচার ক'রে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ক'রে গোটা জাতটাকে রসাতলে ঠেলে দিচ্ছিস। ধর্ম চিরকালের জন্য বেঁচে থাকার মন্ত্র শেখায়। আর তোরা ধর্মের নাম ক'রে গান গাচ্ছিস—'মরিব মরিব সখী নিসচয়মরিব' তোরা তো অবশ্যই মরবি। তোদের অভ্যাস, দৃষ্টি-ভঙ্গী আচরণ না পাল্টালে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমাররাও তোদের বাঁচাতে পারবে না।

তোদের ওখানে আমি যখন ছিলাম তখনকার ভারতবর্ষের মানচিত্র দ্যাখ, আর আজকের মানচিত্রটা দ্যাখ। দেখলেই বুঝবি, তোরা কিসের সাধনা ক'রছিস—জীবনের না মৃত্যুর। জাতীয় সঙ্গীতের সময় কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে বলিস, পাঞ্জাব-সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ। বুকটা টনটন করে না তোদের। পাঞ্জাবের অর্দ্ধেক নেই, সিন্ধু পুরো নেই, বাঙলার তিন ভাগের দু'ভাগ নেই, মনে পড়ে একবারও? পড়ে না আমি জানি। আমার চেয়ে তোদের কে বেশী চেনে বল! আমেরিকা থেকে ফিরে যেদিন তোদের এখানে এলাম, শিয়ালদহ ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে তোরা গাড়ী টেনে নিয়ে এলি, ভাবলাম, দেশ প্রস্তুত, এবার ভারতের উত্থান ঠেকাবে কে? যেখানে বক্তৃতা করি কি জয়ধ্বনি, কি ভীড়, কি উচ্ছ্বাস। যেই বললাম তোদের চরিত্রবান হ'তে হবে, পরার্থপর হ'তে হবে, পেশীগুলো ক'রতে হবে লোহার মতো, স্নায়ু ইস্পাতের মতো। বেশীরভাগ গুটগুট ক'রে পালিয়ে গেলি। এখন দেখছি আমাকেই তোদের মতো বানিয়ে ফেলতে

চাইছিস। আমি নাকি একজন সমাজবাদী ছিলাম। আমার নামে সর্বধর্ম সমন্বয় হ'চ্ছে। আমার গুরুদেবকে দাড়ি লাগিয়ে চেকলুঙ্গি পরিয়ে নাটক হ'চ্ছে। আমি চিকাগোয় গিয়েছিলাম সমাজবাদ ক'রতে নয়। তোদের বাপ চোদ্দপুরুষের সঞ্চিত হিরন্ময় হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে। আমি সর্বধর্ম সমন্বয় ক'রতে যাইনি। ধর্ম পাঁচমিশেলী চুনোমাছ নয়, যে মিলিয়ে মিশিয়ে ঝাল চচ্চরি হবে, ধর্ম হ'চ্ছে মহা সত্য। সত্য এক অখণ্ড, অবিভাজ্য। তেমনি ধর্ম একটাই। তা হ'চ্ছে সনাতন ধর্ম, হিন্দুধর্ম। এ-হঠাৎ কারো মগজ থেকে বেরোয়নি। লক্ষ লক্ষ ঋষিমুনির যুগযুগব্যাপী তপস্যা, সত্যানুসন্ধানের ফলশ্রুতি এই ধর্ম। এই পৃথিবীর নিয়ম যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু হবেই। যার জন্মও নেই, তার মৃত্যুও নেই। আর তাই হ'চ্ছে শাশ্বত সনাতন। আমরাই বিশ্ববাসীকে বুক ঠুকে ব'লতে পেরেছি "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" আমার গুরুদেব আরো সহজ ক'রে বলেছেন, "যত মত তত পথ"। এ কথা পৃথিবীতে হিন্দু ছাড়া কেউ কখনো বলেনি, বলতে পারে না। এই ঔদার্য্য, সহিষ্ণুতা এগুলোই ধর্মের মূলকথা, এ কথা যেখানে নেই, জানবি সেটা ধর্ম নয়, মতবাদ মাত্র। ব্যক্তির মস্তিষ্ক বেরিয়েছে, আবার একদিন শেষও হ'য়ে যাবে। আমার গুরুদেব নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন ক'দিন, কি অনুভূতি হয়েছিল তিনি নিজেই বলে গেছেন ঃ গরু খেতে ইচ্ছে করেছিল, একটা উগ্রতা, রুক্ষতা গ্রাস করেছিল আমাকে। এসব বই তো পড়বি না। "আমার প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত" বইটা পড় বুঝতে পারবি আমি কোন্ ধর্মকে কি বলেছি। এই সঙ্কীর্ণ মতবাদ—হিংস্র, অসহিষ্ণু চিন্তাধারাগুলোকে ধর্ম বলছি এটা আমাদের ঔদার্য্য। জানি তোদের এসব বলে কোন লাভ নেই। মহা তমোগুণে আচ্ছন্ন হ'য়ে চিৎ করা কচ্ছপের মতো সব পড়ে আছিস। তোদের এখন রামায়ণ পড়ালে বুঝে যাবি পরস্ত্রী হরণে কোনো পাপ হয় না, রাবণ ক'রেছিল। মহাভারত পড়ালে শিখে যাবি দু ইঞ্চি জমির জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করা চলে। রবীন্দ্রনাথ পড়ালে শিখবি কবিতা লিখতে গেলে ম্যাট্রিক পাশের

কোন দরকার নেই। শরৎচন্দ্র পড়লে শিখবি উপন্যাস লেখার আগে মদ খাওয়াটা রপ্ত করা দরকার। ধ্বংসের আগে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়। তোদের তাই হয়েছে। আমার গুরু এত শক্তি নিয়ে শিষ্য করার মতো আধার পেলেন মাত্র চোদ্দটা। এখন এক একটা গুরুর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শিষ্য-শিষ্যা। কি করে হচ্ছে বল দেখি? আসলে তোরা কপট, তোদের গুরুরাও বেশীর ভাগ কপট। হিন্দু ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে চরম সত্যকে অনুভব করার পরই আমি তোদের বলেছিলাম, "সত্যের জন্য সব ত্যাগ করা চলে কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।" তোরা প্রথমেই সত্যটাকে ত্যাগ করলি। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামীই তোদের এখন জীবন চলার পাথেয়। এত তো ধর্মচর্চা হচ্ছে, চোখের সামনে খুন দেখলেও তোদের একটা মহা ধার্মিক সাক্ষী দিতে চায় না। কেন বলতে পারিস? সরকার ধর্মবিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী যে আইনই পাশ করুক সাধুসন্ন্যাসীরা টু শব্দ করে না। ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। সাধুদের কি সরকারী চাকরী নাকি যে চলে যাবে। নির্লজ্জের মত অনেকে বলে সাক্ষী দেব, প্রতিবাদ করবো আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? একথা বললেই জানবি, সে বেটা সাধু, সন্ন্যাসী, ধার্মিক কিচ্ছু নয়, মহাভণ্ড। ভিখারী থেকে সাধু হয়েছে, নয়তো নপুংসক ব্রহ্মচারী সেজে আছে, অথবা দাগী আসামী, গেরুয়া দাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। ধর্মচর্চা করলে তার মধ্যে জাগ্রত হবে মহাতেজ মহাশক্তি। এই পৃথিবীর নশ্বরতা আত্মার অমরতা এ তো ধার্মিক লোকেরাই জানে। সে ভয় করবে কাকে? যার মধ্যে গাইগুঁই জড়োসড়ো ভয়ভীত ভাব দেখবি, জানবি সে ধার্মিক লোক নয। একটা গোমমেলে লোক। সে চন্দনেও বসবে, বিষ্ঠাতেও বসবে। ওপরে সখীভাব, ঈশ্বর যা করেন, যেন কত ভগবদ্ভক্ত লোক। আসলে মহা বদমাস। একটু স্বার্থে ঘা লাগিয়ে দ্যাখ্, তখন অন্যরূপ। আর ঈশ্বর ফিশ্বর নেই। থানা, পুলিশ, কোর্ট করে বেড়াবে। কদিন গীতা পড়ে এই দেশের ছেলেরা হাসি মুখে ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে। ফাঁসীর আগে ছেলেগুলোর ওজন

বেড়ে গেছে। এখন নিত্য গীতাপাঠ করে কিংবা গীতার ব্যাখ্যা করে বেড়ায় সেই সব লোকগুলোকে ধরে নিয়ে এসে একটু ধমকে দে, বেলুনের মত চুপসে যাবে। এরা গীতার প্রথম দিকটাও আত্মস্থ করেনি, মাঝের দিকটাও নয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে বলেছেন, ক্লীবতা ত্যাগ কর। এটা অর্জুনকে বলা নয় আমাদেরই বলা। গোটা জাতটার পক্ষেই এ কথাটা ভীষণ জরুরী। এই রকম ক্লীব জাত ভূ-ভারতে দুটো পাবি না। গীতার মাঝের কথাটা হচ্ছে মৃত্যুভয় জয় করা। আত্মার অমরত্ব। যাকে অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, এমন এক পরম সত্যকে হৃদয়ে অনুভব করা। এই অনুভূতি যার একটুও হয়নি জানবি সে বক-ধার্মিক। সে কীর্তন ক'রে কিংবা করিয়ে পাড়ার লোককে সারারাত জাগিয়ে রেখে বিরক্ত করে দিতে পারে, ধ্যানে বসে খানিক পরেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যেতে পারে। সর্বাঙ্গে চিতাবাঘের মতো ছাপছোপ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু ভেতরে ঢুঁ ঢুঁ। হাজার রকম আবর্জনা মিশিয়ে তোরা ধর্মাধর্ম গুলিয়ে ফেলছিস। ধর্ম মানে প্রবৃত্তি নিরোধ। তেজ, সাহস, বীরত্ব, মৃত্যুভয় জয়, সততা, সারল্য, অকপটত্ব। আমাদের ধর্মের শেষ কথা হচ্ছে শক্তি। উপনিষদ বলছে—তেজস্বী হও, শক্তিমান হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ করো। আমি সারাজীবন এই মহাশিক্ষা পেয়েছি। আর তোরা হাজার বছর ধরে শুধু দুর্বল হবার সাধনা করে চলেছিস। এখন আমাদের অবস্থা কেঁচোর মতো। যার ইচ্ছে সেই আমাদের মাড়িয়ে যাচ্ছে। ভাইসব তোদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তোদের জীবনে আমার জীবন, তোদের মরণে আমার মরণ। আমি তোদের বলছি, আমাদের চাই এখন শক্তি, শক্তি কেবল শক্তি। এসব কথা কোন ব্যাটা ধার্মিককে বলতে দেখবি না। শুধু ছেঁদো গল্প। মানুষের দারিদ্র ঘুচবে কি করে, জাতটা বাঁচবে কি করে, শক্তির সাধনা করে দেশটা কি করে অস্তিত্ব রক্ষা করবে সে ভাবনা কারো নেই। এগুলো চুলোয় দিয়ে খালি ব্যাখ্যা হচ্ছে, চুলচেরা বিশ্লেষণ। ভেতরে অনুভূতি নেই একতিল, রাশি রাশি প্রবচন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকেই

দ্যাখ্ না, শ্রীদাম, সুদাম, সুবলের দল হা-কৃষ্ণ যো-কৃষ্ণ করে যমুনার ধারে ধারে কেঁদে বেড়াতো, কৃষ্ণকে না দেখলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, দেখতে পেলে হাউহাউ করে কাঁদতো। শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে যাবার সময়ই পেতেন না। যারা এসব কিছুই করতো না সেই ভীমার্জুনের কাছে না ডাকতেই চলে যেতেন। এসব দেখেও তোদের শিক্ষা হয় না। ভগবান আহাম্মুক নয়, তিনি কে কতটা কাঁদল, ক'লক্ষ নাম জপ করলো দেখেন না। কাজ দেখেন, আচরণ দেখেন, আধার দেখেন। আমার গুরু রামকৃষ্ণ আমাকে একদিন না দেখলে ডেকে পাঠাতেন, ছটফট করতেন। আমি কি রামকৃষ্ণের কীর্তন করতাম? তা নয় আমার আধারটা ভাল ছিল। গিরিশটা মাতাল হলে কি হবে, আধার ভাল ছিল, কোলে টেনে নিলেন ঠাকুর। তাই বলছি ভণ্ডামী না করে আধারটা ভাল কর, পাত্রটা যোগ্য কর। যোগ কর, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ। দিনে দিনে নিজেকে যোগ্য কর। আকাশ থেকে বৃষ্টি হলে জলটা দাঁড়ায় কোথায় বলতো? যেখানে গর্ত আছে, অর্থাৎ পাত্রতা আছে। যেরকম যোগ্যতা, পাত্রতা তোদের, হচ্ছিসও সেইরকম। ভোগবাদ দেহবাদটা ঠিকই বুঝতে শিখেছিস, আর সব বাদ। পঞ্চাশ রকমের বাদ তৈরী করে পরস্পরের বাপান্ত করছিস। তোদের বেদান্ত বোঝাবে কোন শালা! আমি কটা লোককে বোঝাতে পেরেছি? সোজ কথাগুলো তোরা হাজার বছরেও বুঝতে পারলি না। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর্য প্রকাশ কর। সাম-দান-দণ্ড-ভেদ-নীতি প্রয়োগ করে পৃথিবীকে ভোগ কর— তবে তুই ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপ করে ঘৃণিত জীবনযাপন করলে ইহকালে পরকালে যেখানে থাকবি অনন্ত নরকভোগ। নিজের ধর্মে মরে যাবি অন্য ধর্মের কাছে যাবি না, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। এগুলো শাস্ত্রের কথা। এইসব সত্য থেকে সরে এসেছিস বলেই তোদের এতো দূর্গতি। হিন্দুধর্ম থেকে একটা লোক অন্য সমাজে চলে গেলে কি হয় দেখতে পাস না! হিন্দু সমাজের শত্রু তৈরী হয়, তোদের সমাজকে

ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এইসব দেখেই আমি তোদের এ্যাগ্রেসিভ হিন্দু হতে বলে এলাম। যেসব আগ্রাসী চিন্তাধারা পৃথিবীতে এসে গেছে তাতে নিরীহ এবং শুধুমাত্র আত্মরক্ষাপরায়ণ হ'লে তাদের সামনে টিকতে পারবি না। তোদের ধর্ম দিয়ে যদি অন্যদের আত্মসাৎ করতে না পারিস, তারা তোদের গ্রাস করে নেবে। তাই তোদের এখন একটাই কাজ—হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ধর্মের উচ্চ ভাবগুলো সঞ্চারিত করা। তারপর জগৎকে হিন্দুত্বের ভাবাদর্শে প্লাবিত করা। মহৎ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। আর স্বার্থপরের মতো একান্তে বসে জপ, কীর্তন, আলোচনা—মহা তামসিকতা। দেখিস না ধার্মিক মানে মিনমিনে, পিনপিনে, ঢোক গিলে কথা কয়। ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিনের উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না। ওগুলো ধর্মের চিহ্ন নয়; মৃত্যুর চিহ্ন। দেশশুদ্ধ লোক কতোই তো হরি বলছি, কৃষ্ণ বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছে? শুনবেই বা কেন? আহাম্মুকের কথা মানুষেই শোনে না, তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ভগবদবাক্য শোনা, শুধু শোনা নয় অনুসরণ করা। আমার গুরুদেব বলতেন, এ যুগে কৃপা মানে —করে পাওয়া। যা কিছু প্রাপ্য, পরিশ্রম করেই তা অর্জন করতে হবে। কেউ দয়া করে দেবে না। অলস স্তুতি গানে তাঁর আসন কোনদিন টলবে না। হতাশার কিছু নেই। আমাদের জাতটা খুব পুরনো, আর সভ্যতাটাও প্রাচীন। ল্যাংড়া আমের গাছ বুড়ো হ'লে আমের খোলা মোটা হয়, আঁটি বড় হয়, ভেতরে চোঁচ হয়। ভাগ্যের কথা এদেশের হিন্দুধর্ম, হিন্দুজাত আমগাছ নয়। অক্ষয় বটবৃক্ষ। এর ক্ষয় নেই। তাই ভারতবর্ষ আবার উঠবে এ একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে। নইলে জানবি আমাদের শাস্ত্র মিথ্যে অবতার মিথ্যে মহাপুরুষরাও মিথ্যেবাদী। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুত আছেন যথা সময়ে আমি আবার সম্ভব হ'ব। গৌরাঙ্গদেব বলেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হবে মোর এই নাম। ক্ষুদিরাম বলে

গেছে মা আমি আবার আসবো। তারা যে আসেনি কে বলেছে? তারা তোদের পাশে পাশেই হয়তো আছে। নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক সময়ে অভ্যুত্থান হবে। অসুরিক ধর্ম যত প্রবল বেগেই আসুক ভারতবর্ষে তার শেষ সমাধি রচিত হবেই। ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ বল্কলধারী রামচন্দ্রের হাতে নির্বংশ হয়েছে ভারতে। বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে মত পাল্টাল। পুরুরাজের কাছে মার খেয়ে বেচারী বাড়ীতে পৌঁছতে পারেনি। মধ্যপথেই শেষ। কালযবন নিহত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের হাতে। আজ যাদের এতো হুঙ্কার দেখছিস, পবিত্র ভারতভূমিতে একদিন কবরায়িত হ'য়ে শান্তিতে এরা ঘুমুবে। তার জন্য তোদের মহাজাগরণ চাই। তোরা সাময়িক বিভ্রান্ত। তাই কিছু না বুঝেই জড়বাদের ভোগবাদের বিষপান করবার জন্য ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে ছুটছিস। আমি তখনও বলেছি, এখনও বলছি, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাবে, মা কালী পাঁঠা খাবে চিরকাল, আর বলিবর্দের পিঠে চেপে ডমরু বাজিয়ে কৈলাস চষে বেড়াবে শিব। দুটো পাদরী ফাদরীর যেমন কম্মো নয় এই দেশটাকে উল্টে দেওয়া তেমনি দু'একজন বস্তুবাদীর সাধ্য নয় ভারতবর্ষকে অন্যরকম করা। নিজেরাই দেখবি দুমড়ে, মুচড়ে ভেঙ্গে ঠিক ভারত বর্ষের মতো হ'য়ে যাবে। যাচ্ছে কিনা তোরাই বল? তাই বলছি, অর্বাচীনের দল, দেশটাকে দেশের প্রাণশক্তিটাকে একটু দেখবার, চেনবার চেষ্টা কর। বিশ্বের তাবড় তাবড় সভ্যতা সব আজ ইতি হাসের পাতায়, কিন্তু ভারতবর্ষ আজও জীবন্ত। এটা কিসের জোরে জানিস? এই সেই দেশ, যেখান দেবতারা জন্ম নেবার জন্য মারামারি করেন। পৃথিবীতে দেশ তো হাজার গণ্ডা আছে কিন্তু কোন দেশের ধর্মগুরু কবে বলতে পেরেছে, আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি। ইয়া দাড়ি ইয়া জোব্বা দেখবি, কানের পোকা বের করে দেওয়া আজান শুনবি, আকাশ ছোঁয়া গীর্জা দেখবি, কিন্তু ভেতরে লবডঙ্কা। কোন ব্যাটা আজ পর্যন্ত বলতে পারলে না, হ্যাঁ আমি ভগবান দেখেছি। আর আমার গুরুকে দ্যাখ, অশিক্ষিত অর্ধোন্মাদ একটা মানুষ। আমার মতো অবিশ্বাসী

ছোকরাকে হাসতে হাসতে বললেন ঃ দেখেছি কিরে? তোকেও দেখাতে পারি দেখবি? এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই ভারতের উচ্চ দর্শনকে বুঝতে হ'লে চাই শক্তি। শারীরিক এবং মানসিক। শক্তির উৎস হ'ল খাদ্য। কোন্ আহাম্মুক যে হিন্দুদের নিরামিষ খেতে বলে গেল, আর কথায় কথায় উপবাস করতে শিখিয়ে গেল আমি জানি না। তবে গোটা জাতিকে নির্বীর্য, ভীতু, কাপুরুষ, হীনবল নির্মাণে এটা যে খুবই কার্য্যকরী হয়েছে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে তাকালেই চোখে পড়ে। এখন তো এমন হয়েছে মাংস খাবার কথা বললে হিন্দুরা চমকে ওঠে। ধর্ম বুঝতে গেলে, উপনিষদ বুঝতে গেলে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে গেল শক্তি চাই। রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা যতদিন না আমরা শাকসব্জীকে মানুষের শরীরের উপযোগী বানাতে পারছি ততদিন শক্তির জন্য মাংস খাওয়া ছাড়া আমি গত্যন্তর দেখছি না।

মানুষের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে রজোগুণের ক্রিয়া ঘটাতে গেলে মাংসহার চাই। জীবনযুদ্ধে নিরামিষভোজীদের কোন স্থান নেই। মাংসাসীদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে নীরবে তাদের চলে যেতে হয়। আমরা কিন্তু হেরেই যাচ্ছি। হারিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দর্শন বুকের মধ্যে নিয়ে আমাদের ভেতরে সিংহবিক্রমের বদলে ভাবখানা গরুচোরের মতো কেন ভেবে দেখেছিস? শক্তি নেই বলে। শক্তি নেই বলে আমরা শত্রুকে শত্রু বলতে পারি না। ভয়ে মিত্র বলি। কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম সব জানি। দুর্বল বলে সব ধর্মকে সমান বলি। মনে মনে আমরা সকলের কাছে পরাজিত। দুর্বলেরা পরাজয় স্বীকার করতেও পারে না। তাতে সাহস লাগে। দুর্বলের জীবন বড়োই অপমানের, বড়োই লাঞ্ছনার।

তোরাই যুক্তি দিয়ে বিচার করে দ্যাখ্, জীবহত্যা পাপ এই ভেবে সম্রাট অশোক দশ বিশ লাখ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু গোটা জাতি হলো দুর্বল যুদ্ধবিমুখ। ফলে হাজার বছরের দাসত্ব। এটা

কি আরও ভয়ঙ্কর পাপ নয়? একদিকে দু দশটা ছাগলের প্রাণনাশ, অন্যদিকে আমার মা, বোন, দেশ, ধর্মের মর্যাদাহানি দেখেও কিছু করতে না পারার অক্ষমতা। কোনটা বেশী পাপ? তোরাই বল। যাদের গায়ে খেটে রোজগার করতে হয় না তারা খাক শাকপাতা লাউকুমড়ো, কিছু বলার নেই। যারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে তাদের জোর করে নিরামিষাসী করাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। মাংসাহার, পুষ্টিকর খাদ্য কি অসাধ্য সাধন করতে পারে জাপান তার অন্যতম নিদর্শন। তোদের দেখে শেখারও ইচ্ছা নেই। না শিখলে আমার আর কি? প্রকৃতির নিয়মে তোরা একদিন শূন্যে বিলীন হয়ে যাবি। তোদের যদি কেউ নাও মারে তবু তোরা শেষ হয়ে যাবি। কারণ দুর্বল মানুষ বাঁচতে জানে না। এক হতে পারে না। পরস্পরকে কেবল সন্দেহ করে আর ঈর্ষা করে। শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। স্বজাতির সঙ্গে সংঘর্ষ করে।

কশাইখানার ছাগলগুলোকে দেখিস না। যে তাদের কাটছে তার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নেই। গুঁতোগুতি করে সামনের ছাগলগুলোর সঙ্গে। দুর্বল নিরামিষভোজী প্রাণীর এগুলোই বৈশিষ্ট্য। যদি আমাদের বাঁচতে হয় এই স্বভাব এই অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। ঈর্ষা আর হিংসুটেপনা আমাদের দীর্ঘকালীন জাতিগত পাপ। এ পাপ পরিত্যাগ করতে না পারলে তোরা বাঁচবি না। প্রাণশক্তির সত্যি অভাব কিন্তু আমাদের দেশে নেই। নীরবে প্রভূত কষ্ট আর ত্যাগ, হাসিমুখে করতে পারার মতো প্রাণমন এদেশেই বিদ্যমান।

এই দরিদ্র মানুষগুলোর কথাই ধর। পাশ্চাত্য দেশীয় দরিদ্ররা অধিকাংশ পিশাচ প্রকৃতির। আমাদের দেশের দরিদ্ররা দেব প্রকৃতির। মৌলিক উপাদানগুলো আমাদের অত্যন্ত উন্নত। কিছু নির্বোধ লোকেরা একটু ভষ্মাচ্ছদিত করে দিয়েছে মাত্র। ভাবনায় চিন্তায় খাদ্যে অভ্যাসে একটু পরিবর্তন আনলেই জগত আমাদের পদতলে আসবে। এর জন্য চাই ভগবানের নামে আষাঢ়ে অলৌকিক গল্প বাদ দিয়ে শক্তি এবং

জ্ঞানের চর্চা। আমরা মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে বলহীন। বলহীনেরাই আজগুবী বেল্‌কোমো গল্প করে। কুঁড়েমী আর বৈরাগ্যের তফাৎটাও বুজতে পারে না। তামসিকতাকে মনে করে ধর্ম। জীবন্ত ভগবান মানুষকে উপেক্ষা করে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দিচ্ছিস আর পাথরের মাটির কাঠের দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ছিস। মুখে বলছিস জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ। কিন্তু তোদের আচরণে একটাই মার্গ, ছুঁৎমার্গ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চামর দোলানো, আর ভাতের থালা সামনে রেখে দশ মিনিট বসব না আধ ঘণ্টা এই বিচারের নাম ধর্মও নয় কর্মও নয়। এর নাম পাগলাগারদের কাণ্ড কারখানা। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের পিণ্ডি করছেন। ধর্মের নামে কাঠে মাটিতে পাথরে মাথা ঠুকে জীবন কেটে যাচ্ছে তোমাদের।

আর জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। তোদের এটুকু বোঝার ক্ষমতাও নেই যে এগুলো মহা ব্যারাম। দেশময় একটা অসুস্থতা বিকৃতি। তোদের মধ্যে এখনও যারা একটু সুস্থ আছিস মাথাটা ঠিক আছে হৃদয়টা একনো মরে যায়নি, তাদের চরণে আমার দণ্ডবৎ। তোরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়। বিরাটের উপাসনা প্রচার কর। গাঁয়ে গাঁয়ে যা। ঘরে ঘরে যা! লোক হিতে জগৎ কল্যাণে নিজেকে ডুবিয়ে দে। নিজের ভাবনা যখনই ভাববি তখনই মনে অশান্তি। তোদের শান্তির দরকার কি? সব ত্যাগ করে দে। শান্তির ইচ্ছাও মুক্তির ইচ্ছাও ত্যাগ করে দে। কোনো চিন্তা রাখবি না। নরক স্বর্গ ভক্তি মুক্তি গ্রাহ্য করবি না। নিজের ভালো কেবল পরের ভালো করলে হয় এই সোজা কথাটা নিজে বোঝ এবং সকলকে বোঝা। নিজের মুক্তি ভক্তিও পরের মুক্তি ভক্তিতে হয়। এই কাজে মেতে যা, উন্মাদের মতো লেগে যা। নিজে নরকে যা পরের মুক্তি হোক। এই ভাবনা চাই। এটাই ভারতের ভাবনা তোরা সর্বদা মনে রাখবি। এই চিন্তা ভুলে শুধু নিজের কথা

ভাবছিস বলেই তোদের জীবনটা প্রায় নরক হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই ভূমি, যেখানে সর্বপ্রথম মানুষের যথার্থ স্বরূপ, অন্তর্জগতের সহস্য, আত্মার অমৃতত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বরে অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শগুলো এখানেই চরম পরিণতি লাভ করেছিল। এই দেশ সবকিছুর পুণ্যভূমি। এখানে মানবতার সমুদ্রে সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ, আনন্দ বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোতে সংঘাতে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন। যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস, বিলাসের পানপাত্র গৌরবের উচ্চ শিখর ক্ষমতার প্রাচুর্য্য, এইসব মায়ার শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে শুধু এখানকার মানুষ। এখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়—জীবন অনিত্য, পরম সত্যের ছায়া মাত্র। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ঝাঁপ দেয়—মানুষ দেবতা হয়। এ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যরা ভাবতেই পারে না। পৃথিবী ঘুরে তো দেখলাম কোথায় কি আছে। যেমন প্রাচুর্য্য, তেমনি দুর্নীতি। আমাদের দেশে এতো অভাব, কিন্তু একমুঠো ছাতু খেয়ে মানুষ এতো সত্যনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ থাকতে পারে, এ ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও দেখিনি। পৃথিবীর যেখানে যাবি গার্লফ্রেণ্ড পাবি, শয্যাসঙ্গিনী পাবি, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী-সহধর্মিনী তুই এদেশ ছাড়া কোথাও পাবি না। স্বামীর মঙ্গ ল কামনায় একনিষ্ঠ হ'য়ে শরীরে মনে শুচিতা নিয়ে ধূপের মতো নিজেকে জ্বালিয়ে দেয় শুধু ভারতের নারী, হিন্দুনারী। এই নারীদের ওপর তোরা ছেলেরা অনেকেই যে অত্যাচার করে থাকিস, অন্য দেশ হ'লে তোদের মুখে লাথি মেরে ওরা পরপুরুষের হাত ধরে চলে যেত। যায় না— দেশটা ভারতবর্ষ বলেই। কারণ এদেশের সম্পর্কগুলো শরীর এবং সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্টি নয়। হৃদয় এবং আত্মা থেকে স্বতোৎসারিত প্রত্যেকটি সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অন্যত্র সব অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা দিয়ে ঘেরা। আজ স্ত্রী স্বামী পাল্টাচ্ছে তো কাল স্বামী স্ত্রী বদল করছে। খুশী মতো। শুনলে হাসবি বৃটেন,

আমেরিকায় স্বামীদের নাক ডাকলে, বগলে গন্ধ হ'লে স্ত্রীরা কোর্টে গিয়ে ডাইভোর্স প্রার্থনা করে। এদের ছেলেদের কথাগুলো ভাব, তারা বুঝতেই পারেনা, কোনটা সত্যিকারের বাপ, কোনটা তার নিজের মা। সেও সেইভাবেই মানুষ হয়। রক্তের আত্মীয়তার কোন সম্বন্ধই গড়ে ওঠে না। প্রাণহীন একটা সমাজ, হোটেলের মতো সামাজিকতা। ব্রথেলের মতো আন্তরিকতা। আর ভারতবর্ষ! প্রত্যেকটি সম্পর্ক শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, স্নেহে, পবিত্রতায়, মমতায়, মাধুর্যে মণ্ডিত। এদেশে জন্মে খুব সহজে এগুলো পেয়ে গেছিস তো! তাই মূল্য বুঝতে পারিস না। তাই বলছিলাম এদেশে যখন জন্মেছিস জীবনটা ছেলেখেলা করে কাটাসনে। এদেশে মানুষের জন্ম একটা এ্যাক্সিডেন্ট নয়, নয় বাবা মা'র কামনার ফসল মাত্র। এদেশে যে জন্মায় সে একটা মিশন নিয়ে জন্মায়, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মায়। সে নিজের জন্য জন্মায় না। শুধু নিজের সুখ যে খোঁজে সে তো পশু। বহুভাগ্যে এদেশে মানুষ জন্ম হয়। জন্মভূমি, কর্মভূমি তো সব দেশ—যেখানে জন্মাবি, কর্ম করবি—সেটাই। কিন্তু পুণ্যভূমি মোক্ষভূমি বলতে বিশ্বে ভারত ছাড়া আর কেউ নেই। মুক্তির কথা, মোক্ষের কথা দুনিয়ার কোন মহাপুরুষ বলতে পারেনি। জীবকে শিবজ্ঞানে দেখা কিম্বা বহুরূপে সম্মুখে তোমার, এসব আমার কথা না, এই দেশের কথা। ভারতবর্ষের প্রাণের কথা ভারতের মর্মবাণীকে অনুভব করতে চেষ্টা কর, নিজেরও আত্মোপলব্ধি হবে। তুই বুঝবি তুই ব্রহ্মময়ীর বেটা। অমনি দেখবি তেজ ঠিকরে পড়বে। জাগ্রত হবে মহাশক্তি। যতক্ষণ তোরা নিজেকে ভাববি দেহ, ততক্ষণ তোদের সঙ্গে একটা কৃমিকীটের কোন পার্থক্য নেই। পরমাত্মার অংশ হয়ে মহাশক্তির আধার হয়ে তোদের কি করুণ পরিণতি! এমনি হয়। নিজের স্বরূপ ভুলে গেলেই মানুষ বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। তোরাও তাই সব কথার অপব্যাখ্যা আর সব কাজের বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলছিস। তোদের অনেক দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ অনৈক্য সংগঠনহীনতা। তাই আমি বলেছিলাম এখন চাই ইসলামিক দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক।

এটা একটা সরল দৃষ্টান্ত। তোরা মনে করে নিলি আমি হিন্দু মুসলীম ঐক্য চেয়েছিলাম। আমি ঐক্যবদ্ধ দেখতে চাই গোটা মানব সমাজকে। তার ভিত্তি হবে প্রেম সহিষ্ণুতা। অর্থাৎ বেদান্ত বা হিন্দুত্ব। তাৎক্ষণিক উদাহরণ মানে শেষ সিদ্ধান্ত নয়। যে ইসলাম নিজের সমাজেই অহোরাত্র সংঘর্ষ করে, নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের ঘৃণা করে এইরকম একটা দর্শন দিয়ে মানব সমাজকে বেঁধে রাখা যায় না। একমাত্র বেদান্তই পারে এই কাজ করতে। কারণ বেদান্ত দর্শনের স্থান যাবতীয় ধর্মমতের পটভূমিকায়। বেদান্তের সঙ্গে কোন ধর্মমতের বিরোধ বিসংবাদ নেই। বেদান্ত বিশ্বাস করে জেনে অথবা না জেনে প্রত্যেক ব্যাক্তি ব্রহ্মশক্তির উন্মেষের কাজেই যত্নপর। এগুলো ভীষণ ঔদার্য্যের কথা। উদারতা একেবারে শুক্নো জিনিষ। তাই সে সহজেই মরে যায়। এই ধর্ম মানুষের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা জাগাতে পারে না। সকলের প্রতি বিরোধ ছড়াতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারবার পতন ঘটেছে পৃথিবীতে। সমান্য কিছুলোকের ওপরই তার প্রভাব। এর কারণ নির্ণয় খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে বলে। আমরা তা চাই না। কারণ তাতে প্রত্যক্ষভাবে কিছু লাভ হচ্ছে না। স্বার্থদ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। হজরত মহম্মদ এলেন যারা তাঁকে অনুসরণ করল তাদের তিনি নানা ফললাভেরপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। যারা তাঁকে অনুসরণ করল না তাদের জন্য রইল অনন্ত দুর্গতি। লোভ এবং ভয়। এইভাবে তিনি তাঁর মত প্রচার করলেন। প্রচারশীল আধুনিক ধর্মগুলি ভয়ঙ্কভাবে গোঁড়া। যে সম্প্রদায় যত বেশী অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে তাদের তত বেশী সাফল্য। বেশী সংখ্যক মানুষ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে বহু জাতির সঙ্গে বসবাস করে এবং বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বহু বাগবিস্তার স্বত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিই চলতে থাকবে। তোরা নির্বোধের মত ভাবের ঘোরে থাকলে হারিয়ে যাবি। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তোদের এখন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

আমরা বোকার মতে জড়সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করছি। করব নাই বা কেন? হাত বাড়িয়ে না পেলে আঙুর ফল টক্ বলাই তো ভালো। ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু মানতেই হবে যে ভারতে যথার্থ ধার্মিক লোক আছেন বড় জোর এক লক্ষ। মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কোটি কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকতে হবে, না খেয়ে মরবে এটা কি বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক? মুসলমানেরা হিন্দুদের পরাজিত করল। এ ঘটনা সম্ভব হল কি করে? বাস্তব অবস্থা বাহ্য সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতাই এর কারণ। বাইরের সভ্যতা শুধু আবশ্যক নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক। তাতে লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়। সাধুর মুখে এমন কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছিস তাই না? অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে দুটো অন্ন আমাকে দিতে পারে না তিনি আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না। দরিদ্র লোকেদের ইহজীবনেও নরক পরলোকেও নরক। আমার কথা বুঝতে পারছিস? ভারতের ধর্ম নিয়ে ইউরোপের মতে একটা সমাজ গড়ে ফেল দেখি! আমার খুব বিশ্বাস আছে তোরা পারবি। কারণ এটা সম্ভব। এটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে যদি কুঁড়েমি ত্যাগ করে একটু কর্মঠ হতে পারিস। সেই সঙ্গে দরকার প্রেম সরলতা আর সহিষ্ণুতা। জীবন মানেই হচ্ছে বিস্তার। বিস্তার আর প্রেম একই কথা। সুতরাং, প্রেমই জীবন। স্বার্থপরতাই মৃত্যু। জীবন থাকতেও মৃত্যু। দেহের অবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না একথা কেউ যদি বলে তবু তাকে স্বীকার করতে হবে যে স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু। পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। শতকরা নব্বুইজন নর-পশুই মৃত প্রেততুল্য। আমার আত্মন, ভারতের ছেলেরা, যাদের হৃদয়ে মানুষের জন্য দেশের জন্য প্রেম নেই তারা মৃত ছাড়া আর কি? তাই আমার আকুলতা তোরা দরিদ্র অজ্ঞ ও নিপীড়িত জনগণের ব্যথা প্রাণে অনুভব কর্, সেই অনুভবের বেদনায় তোদের হৃদয় রুদ্ধ

হোক্ মাথা ঘুরতে থাকুক তোরা পাগলপারা হয়ে যা। তারপর ভগবানের পাদপদ্মে তোদের অন্তরের বেদনা জানিয়ে দে। তবেই ভগবানের নিকট থেকে শক্তি ও সাহায্য আসবে। অদম্য উৎসাহ অনন্ত শক্তি আসবে। সারাটা জীবন আমার মূলমন্ত্র ছিল এগিয়ে যা এগিয়ে যা। এখনও আমি বলছি নির্ভয়ে এগিয়ে যা। এখন তো বেশ আলো দেখা যাচ্ছে চারিদিকে। এখনও বলছি মাভৈ, অভী। এগিয়ে যা। কোন ভয় নেই। ওপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশ মণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে করিস না ওগুলো তোকে পিষে ফেলবে। অপেক্ষা কর দেখবি অল্পক্ষণের মধ্যেই সবই তোদের পদতলে। টাকায় কিছু হয় না। নামেও হয় না যশে বিদ্যায় কিছু হয় না। ভালবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধা বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় পাঁচিলের মধ্যে দিয়েও পথ করে নিতে পারে। চরিত্রের সেবার জ্বলন্ত নিদর্শন রূপে অনেক ব্যক্তি আছেন আমাদের সামনে। মহাবীর হনুমানের চরিত্রকেই এখন তোদের আদর্শ করতে হবে। দেখ্না রামের এক আদেশে সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল। জীবনে মরণে দৃকপাত নেই। মহাজিতেন্দ্রিয় মহাবুদ্ধিমান। দাস্য ভাবের ওই মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। ওইরূপ ভাব হলেই অন্যান্য মহাভাবের স্ফূরণ আপনা আপনিই হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা এই হচ্ছে সাফল্যের একমাত্র রহস্য। অন্য কোন পথ নেই। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা। ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা। শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এইরকম একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। এই রকম একটা চরিত্র নিয়ে তোরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিস। রঙ্গ রসিকতা করিস। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। একে তো অজীর্ণ রোগীর দল, তাতে আবার লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর

তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে যেখানে যাবি দেখবি খোল করতালই বাজছে। ঢাক ঢোল দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? এসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষী বাজনা শুনে শুনে কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে, কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়। ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্র তালে দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। মহাবীর কিম্বা বজরংবলী ধ্বনিতে দিগদেশ কম্পিত করতে হবে। করছিস তাই তোদের ওপর আমার ভরসা বেড়ে যাচ্ছে। যেসব গীতবাদ্যে মানুষের হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহকে উদ্দীপ্ত করে সেসব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ। খেয়াল টপ্পা বন্ধ রেখে এখন মানুষকে ধ্রুপদ গান শোনানোর অভ্যাস করা। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার কর। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে চেষ্টা কর। এই আদর্শ অনুসরণ করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা একাও এইভাবে চরিত্র গঠন করিস তাহলে তোর দেখে হাজার লোক এগিয়ে আসবে। কিন্তু দেখিস আদর্শ থেকে কখনও যেন এক পা-ও হাটিসনি। কখনও সাহসহীন হবি না। খেতে শুতে পরতে গাইতে বাজাতে ভোগে রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবেই মহাশক্তির কৃপা হবে। যদি কখনও দুর্বলতা আসে ভাববি আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি হীনসাহস? হীনবুদ্ধি হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে আমি বীর্য্যবান আমি মেধাবান আমি ব্রহ্মবিৎ আমি প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। আমি অমুকের চেলা, কাম কাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। এই অভিমান যার নেই তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। এইরকম অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখলে দেখবি হীনবুদ্ধি হীনভাব আর নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে

দিবি না। মহাবীরকে স্মরণ করবি মহামায়াকে স্মরণ করবি। এদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। এদেশে এমন একটা ধর্ম আছে যা সব কালের এবং সব মানুষের জন্য। এখন একটু পড়ে গেছে বটে কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে।

দেখিসনি নদী বা সমুদ্রের তরঙ্গ যত নামে তারপর সেটা তত জোরে ওঠে। এখানেও এইরকম হবে। দেখছিস না পূর্বাকাশে রক্তিম অরুণোদয় হয়েছে। সূর্য্য ওঠার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা। সংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলবে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে বল্‌গে — ভাই সব ওঠো জাগো কতদিন আর ঘুমোবে? আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। সেই সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিবি। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক্ আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক্। বেদ বেদান্ত গীতা উপনিষদ পড়ে তোরা শিখলি জাত পাতের লড়াই। আগে বামুন হয়ে বামনাই দেখিয়ে শেষ করে এনেছিলি সমাজটাকে। এখন সমাজটাকে ধ্বংস করার জন্য আবিষ্কার করেছিস ব্রাহ্মণ্যবাদের দৈত্য। সবশেষ করে দেবে তারা। অতএব উঠে পড়ে লাগো উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। যাতে হিন্দু সমাজের সর্বনাশ করা যায়। তোরা কি জানিস বেদ লিখেছেন যেসব ঋষিরা তারা অনেকেই ব্রাহ্মণ নয়। জন্মে এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হয় না। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছেন ছিলেন ক্ষত্রিয়। বশিষ্ঠ ছিলেন বৈশ্য সমাজের। হলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ব্যাসদেব কি ছিলেন? রাম এবং কৃষ্ণ জগতপূজ্য? এরা কি ব্রাহ্মণ ছিলেন? একটু ভেবে চিন্তে হিসেব করে কথা বল্‌ কাজ কর। আমার গুরুদেব তো ব্রাহ্মণ। বেছে বেছে শিষ্য করলেন শূদ্রদের। যারা উপনিষদ

লিখেছেন তাদের বেশীর ভাগ শূদ্র। মহীদাস জুতো তৈরী করতেন। তিনি লিখলেন ঐতরেয় উপনিষদ। কেউ প্রশ্ন তুলেছে? মুচির লেখা উপনিষদ পড়ব না। তখন যে আমাদের মরণদশা ধরেনি। গীতায় সকল নরনারী সকল জাতি সকল বর্ণের জন্য পথ উন্মুক্ত আছে এটা বুঝতাম। রামায়ণ মহাভারত মিথ্যে কল্পনা কাব্য ব'লে তর্ক ক'রে শুধু একলব্য আর শম্বুক সত্য বলার মত ভীমরতি তখনও আক্রমণ করেনি আমাদের। ভীমরতিটা ধরছে মুসলীম আমল থেকে। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হবে একদল বামুন বলল শিবাজী খাঁটি ক্ষত্রিয় নয়। বেটাদের কাছে আকবর আওরঙ্গজেব হচ্ছে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বুদ্ধি আবার তোদের পেয়ে বসেছে। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের উচ্ছেদের নামে নিজেদের সর্বনাশে উদ্যত হয়েছিস। শত্রুদের সাহায্য নিয়ে আত্মীয় হত্যায় মেতে উঠেছিস। এসব ছেড়ে বিদ্যে বুদ্ধি শক্তি রাষ্ট্রগঠনে জাতি গঠনে লাগা। সমাজের কাউকে ঘৃণার মধ্যে অবজ্ঞার মধ্যে রাখা চলবে না। এখন তো অনেক শিক্ষা দীক্ষা হয়েছে তোদের। তবুও শেওলাতে পা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন? ত্যাগ নিয়ে তেজ নিয়ে গোঁ ধরে কাজ আরম্ভ করে দে, দেখবি সব আপ্‌সে হয়ে যাবে। তবে তোদের একটি মস্ত বদ অভ্যেস আছে। কিছুদিন একটা সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে বলতে শুরু করিস, আমাদের দল ঠিক উপযুক্ত নেতা নেই। এইসব বলে সংগঠনে একাট অনাস্থার ভাব তৈরী করে দিস। আর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেউ মানতে চাইছে না দেখে ভেতরে ভেতরে নেতা হবার জন্য পাগল হয়ে উঠিস। এতে কি আর জাত ওঠেরে? নেতা হতে গেলে অনেক গুণ থাকার দরকার। দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব করতে গেলে শ্রেষ্ঠ নেতা হতে হলে শিশুর মতো হওয়া দরকার। শিশুকে দেখলে আপাততঃ অন্যের ওপর নির্ভরশীল মনে হলেও সেই সমগ্র বাড়ীর রাজা। গোটা পরিবারে নেতৃত্ব করে সেই শিশুটি। নেতাকে থাকতে হবে ব্যক্তির গণ্ডীর বাইরে। নতুবা হিংসা ও কলহে সব চুরমার হয়ে যাবে। এর সাথে চাই মানুষকে বোঝাবার

ক্ষমতা এবং যা বলবি তা হাতে নাতে করে দেখাবার ক্ষমতা দেখলেই লোকে তোর নেতাগিরি মেনে নেবে। আর যদি তোতাপাখীর মত শুধু শ্লোক আওড়াস বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত অপরের দোহাই দিস কাজে কিছুই না দেখাস তোর কথা কে শুনবে বল? এখন দেশে যেমন ভাল কর্মী চাই তেমনি ভালো নেতাও দরকার। দেশের সবরকমের পতনের মূলে তো এই। ভালো নেতা আর কর্মীর শূন্যতা। এটা তোদেরই পূরণ করতে হবে। তোরা পারবি না কেন? তোরাই তো পূর্বে বৈদিক ঋষি ছিলি, শুধু শরীর বদলিয়ে এসেছিস বৈ তো নয়। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তোদের ভেতর অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগা। লেগে পড়-কোমর বাঁধ। কি হবে দু-দিনের ধন, মান নিয়ে। আমার ইচ্ছাটা কি জানিস? আমি মুক্তি ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে তোদের মধ্যে এইভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া। একটা মানুষ তৈরী করতে যদি লক্ষ জন্ম নিতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত। আমি মরণের ভয়ে ভীত হই না। তোরাও হবি না। মরতে হয় একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহ মৃত্যু চিন্তা করে বারে বারে মরবি কেন? মৃত্যু জীবনে কোন আকস্মিক ঘটনা নয় স্থায়ী ঘটনাও নয়। জন্ম মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক ক্রম মাত্র। তাহলে ইট পাটকেলের মত মরবি কেন? বীরের মত মর। এই অনিত্য সংসারে অপ্রয়োজনে দুদিন বেশী বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে দেশের জন্য অপরের একটুখানি কল্যাণের জন্য লড়াই করে বীরের মত মরাটা ভাল নয় কি? নিজের কল্যাণের জন্য আমি তো ইচ্ছা করলে হিমালয়ের গুহায় গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি। আর আজকাল দেখতে পাচ্ছিস তো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই। কোন না কোন রকমে জোটেই জোটে। বিদেশে গেলে তো রাজার হালে থাকতে পারি। তাহলে এত কাজ করছি কেন? কেন এদেশে পড়ে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারি না। সমাধি ফমাধি

তুচ্ছ বলে বোধ হয়। তুচ্ছং ব্রহ্মপদং হয়ে যায়। তোদের মঙ্গলকামনা হচ্ছে আমার জীবনের ব্রত। যেদিন এই ব্রত শেষ হয়ে যাবে সেদিন দেহটা ফেলে দিয়ে চোঁচা দৌড় মারব। বুঝলি। তোদের একান্তে বসে আজ ভাবা দরকার, যে হিন্দুজাতি মানবাত্মার মহিমা এত উচ্চতানে জগতকে শোনাল সেই জাতি এত গলিত পচনশীল হয়ে যায় কি করে? বড় হতে গেলে কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটে গুণ অবশ্য অবশ্যই প্রয়োজন। প্রথম হচ্ছে সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। দ্বিতীয় হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের শূন্যতা। তৃতীয় যারা সৎ কিম্বা সৎ কাজ করতে সচেষ্ট তাদের সহায়তা করা। হিন্দুদের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা এবং নানান গুণাবলী সত্ত্বেও তাদের ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই তিনটি গুণ না থাক। তোরা যদি কখনও পাশ্চাত্যে যাস দেখবি এই ঈর্ষা জিনিষটা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাই জগতে তাদের অপ্রতিহত গতি। আর আমরা পড়ে আছি এই দাসজাতির উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত উৎকট অজ্ঞতা ঘৃণা প্রাচীন মুর্খতা জাতিবিদ্বেষ আর হিংসার বদ্ধ জলাশয়ে। সর্বব্যাপী এই বদ্ধতার মধ্যে তোরা অসংখ্য মহাপ্রাণ মাথা উঁচু করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিস? সারাদেশে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করেছিস। এতেই বুঝতে পারছি আমার আসার উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হয়নি। এ দেশের তথাকথিত চিন্তাশীলদের মত ভুল করবি না। তাদের ধারণা আমাদের সকল দুর্ভাগ্যের এবং দুরবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে ধর্ম। তাঁরা মনে করেন হিন্দুধর্মের ধ্বংসসাধনই উন্নতির একমাত্র উপায়। এরা ভারতের ধর্মকে নষ্ট করার সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হলেন কেন? কারণ তাদের মধ্যে কেউই নিজের ধর্ম ভালোভাবে পড়েননি বা আলোচনা করেননি। একজন ব্যক্তিও সকল ধর্মের প্রসূতি হিন্দু ধর্মকে বোঝবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্যে দিয়ে যাননি। আমি দাবী করছি হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই এবং ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তা ঠিক নয়। বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে

যেভাবে কাজে লাগানো উচিত ছিল তা হয়নি বলেই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এর প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করতে প্রস্তুত। আমি এই শিক্ষাই দিয়ে থাকি এবং এইটি কাজে পরিণত করার জন্য আমাদের সারা জীবন চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের কাজের মূল কথাটা মনে রাখবি, ধর্মে একটুও আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। তোরা কি সাম্য-স্বাধীনতা কাজে এবং উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পারিস? এইটিই তোদের কাজ এবং এটা করতেই হবে। তোদের একটা বদ স্বভাব গড়ে উঠেছে অতীতকে নিন্দা করা আক্রমণ করা। অতীতের দিকে বেশী তাকানোই ভারতবর্ষে দুঃখের মূল। আমি কিন্তু তোদের বিপরীত কথা বলব। অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। তোরা হিন্দুরা যত বেশী অতীতের পর্য্যালোচনা করবি ভবিষ্যত ততই গৌরবময় হয়ে উঠবে। এবং যে কেউ এই অতীত গৌরবকে মানুষের কাছে তুলে ধরবে সেই দেশের পরম উপকার করবে। তোরা একটা কথা সব সময় মনে রাখবি, আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি গুলো খারাপ ছিল বলে ভারতের অবনতি হয়েছে তা নয়। অবনতির কারণ ওই রীতিনীতিগুলোর যে ন্যায় সংগত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তা হতে দেওয়া হয়নি। ভুলবি না পৃথিবীতে যদি এমন কোন দেশ থেকে থাকে যাকে পুণ্যভূমি বলে বিশেষিত করা যেতে পারে সে আমাদের এই ভারতবর্ষ। যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা দয়া পবিত্রতা শান্তভাব প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হয়েছে সে এই ভারতবর্ষে। যদি এমন কোন দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অর্ন্তদৃষ্টির বিকাশ হয়েছে তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে তোরা কেউ এমন একটা যুগ দেখিয়ে দিতে পারবি না যে যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করার মত মহাপুরুষের অভাব ছিল? কিন্তু ভারতের কার্য্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক সেকাজ রণবাদ্য বা

সেনাবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশির পাতের মত সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছে। আমাদের মাতৃভূমির প্রতি জগতের ঋণ অপরিসীম। বিজ্ঞানেও আমাদের দান কিছু কম নয়। বীজগণিত জ্যামিতি জ্যোতির্বিদ্যা এবং বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব স্বরূপ মিশ্রগণিত সবগুলোর জন্ম ভারতবর্ষে। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক শব্দ ভারতে আবিষ্কৃত। শল্যচিকিৎসা পদার্থ বিদ্যা রসায়ণ বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের অবদানের প্রশংসা করেছেন স্যার উইলিয়াম হাণ্টার। সাহেব বললে তোদের বিশ্বাস হয় তাই সাহেবের নাম বললাম। এগুলো তোরা ভুলে গেছিস। ভুলে গেলেই সব গেল। একটা মানুষের স্মৃতি চলে গেলে কি হয়? পাগল। একটা জাতি অতীত ভুলে গেলে তারা হয় হতভাগ্য। তোদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। অচেতন আত্মবিস্মৃত। নিজেকে ভাবছিস কৃমিকীট। ভাবছিস বলেই তোদের মধ্যে আর মানুষ চোখে পড়ছে না। লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, অহঙ্কারের এক একটা ডিপো হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। যেখানে বসছিস উঠছিস কথাবার্তায় খানিকটা হতাশা আর নোংরামি ছড়িয়ে দিচ্ছিস। চরিত্র নেই, পবিত্রতা নেই, সাহস নেই, হৃদয়বত্তা নেই। শুধু লেকচার দিয়ে জগৎ জয় করার মতলব। ফলে সব জায়গায় ভণ্ডামী। ধর্মের জগতে ভণ্ডামী। বাবাদের, ধর্মগুরুদের ছড়াছড়ি। কাতারে কাতারে শিষ্যবর্গ, টুসকি মেরে দ্যাখ্ দুর্নীতিতে সব ভট্ ভট্ করছে। রাজনীতির হাটে যা, মাথা ঘুরে যাবে! দু'শো দল, তার আবার দু' হাজার উপদল। আর সব গুছিয়ে নেবার তালে। ত্যাগের ভাবনা নেই কোথাও। ভোগসর্বস্ব জীবনে ক্লান্ত পৃথিবী ছুটে আসছে তোদের কাছে আশ্রয় নিতে। একটু শান্তির জন্যে। ত্যাগে, তপস্যায় তোরা হবি জগতের আশ্রয়স্থল। তোদের ধর্মসংস্কৃতির ছত্রছায়ায় তাপিত পৃথিবী খুঁজে পাবে পরম শান্তি। তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিস না। আমাদের হাঁটুর বয়সী পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট দর্শন

গুলোকে আঁকড়ে ধরে কামড়াকামড়ি করে মরছিস। যে দর্শনকে অনুসরণ করে গোটা পাশ্চাত্ত্য জগৎ আজ শান্তি হারিয়েছে, সুখ হারিয়েছে, স্বাভাবিক নিদ্রা হারিয়েছে। নির্বোধের মতো সেই মরীচিকার পিছনে ছুটে তোদের অমূল্য জীবন নষ্ট করছিস। একটু শান্ত চিত্তে ইউরোপ, আমেরিকা কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যের ভাবনা-চিন্তা জীবন দর্শনগুলোকে বিশ্লেষণ করে দ্যাখ। ওদের ওপরে যতোই ধর্ম মানবতা কিম্বা সাম্যবাদের নামাবলী থাক ভেতরে আছে ভোগ শুধুই ভোগ। অর্থাৎ পশুত্ব। তাই আজ তাদের যতোই দাপট দেখিস না কেন হুংকার শুনিস না কেন, একদিন দেখবি তাসের ঘরের মত সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ভোগবাদী দর্শনে হয় না। এরা কিছুদিন পৃথিবীতে একটা হুল্লোড় সৃষ্টি করে আবার ঠিক জলের বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপে জড়বাদের অন্তিম শয্যা তোরা তো দেখতে পাচ্ছিস। অন্যদেরও একই দশা হবে।

আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে নিকট থেকে দেখেছি। মধ্য প্রাচ্যও দেখছি। আর তোরা জানিস সহজে কিছু মেনে নেবার স্বভাবই নয় আমার। আমার অমন গুরুকেও আমি বাজিয়ে নিয়েছি। ঠিক তেমনি সব বাজিয়ে দেখে তবেই আমি হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। তার গভীরে ঢুকে অমৃতস্বাদ অনুভব করে তোদের ডাক দিলাম। হিন্দুত্বের শাশ্বত বাণী অমৃত ধারায় সিঞ্চিত করতে হবে গোটা জগৎকে। কে করবে? তোরা করবি, তোরা! তাই তোদের আমি বলে এলাম 'বি এ্যাণ্ড মেক'। নিজে হ' এবং অন্যকে তৈরী কর। সে সব দেখছি না। নিজে ভাল হওয়ার বালাই নেই, অন্যকে হ'তে বলছিস। সবাই সবাইকে উপদেশ দিচ্ছিস। হাজার গণ্ডা সংগঠন। সবাই নাকি দেশের সেবা করবে। কাঁড়ি কাঁড়ি আদর্শ। কিন্তু মানুষ কোথায়? অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতিকে ভিত্তি করে কত দল তো তৈরী করেছিস। টিকছে একটাও, টিকছে না। কোন সংগঠন বেশীদিন একভাবে কাজ করতে পারে না। তিনটে লোক পাঁচমিনিট একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। কেন পারে

না বল তো! শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলে আমরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। দাসত্ব করতে করতে মনুষ্যত্বই চলে গেছে। নীচতায়, ঈর্ষায় তোরা সব কণ্টকিত। অনেক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার অভ্যাসই নেই। গোটা মানুষ পূর্ণ মানুষ কোথায়? দলে পণ্ডিত আছে, ধার্মিক আছে, তাত্ত্বিক আছে, মানুষ নেই। এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করলি, কিন্তু সবকিছুর মূলে যে মানুষ, তাকে মানুষ করার কোন পরিকল্পনা করলি না। মানুষ নেই বলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তাই আমি অর্থনীতি, রাজনীতি না বলে তোদের মানুষ হ'তে বলেছিলাম। শুধু নিজের সুখ খুঁজে খুঁজে আর বড়ো বড়ো সব কথা শিখে গোটা সমাজটাকে পশুসমাজ করে ফেলেছিস। স্বার্থপরতার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে সব কিলবিল করছিস। ওঠ একবার উঠে দাঁড়া। অনন্ত শক্তির মূলাধার তুই। ভীরুতা, কাপুরুষতা ত্যাগ কর। নিজেকে শুদ্ধ কর, পবিত্র কর, পরার্থে উদ্বুদ্ধ কর। ছোটলোকের মতো চারপাশে শুধু খারাপ দেখবি না। যেখানে যেটুকু ভাল আছে গ্রহণ কর, না থাকলে নিজে দৃষ্টান্ত হ'। তোকে ঘিরে গড়ে উঠুক একটা দল, যারা সারা দেশের মানুষকে এই নর্দমা থেকে টেনে তুলবে। বিশ্বাস—বিশ্বাস, নিজের ওপরে বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস, মানুষের ওপর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যা। চরৈবেতি-চরৈবেতি। পিছন পানে তাকানো নয়। দেশের এই অসহনীয় অবস্থা তোদের কাছে একটা মহাসুযোগ। এ সুযোগ সব যুগে আসে না। দেখছিস না, সব মানুষ নীরবে কাঁদছে। মুক্তি চাইছে। তুই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবি! আমাকে দেখেও! আমাকে হাতের কাছে পেয়েও! অসম্ভব। ভারতবর্ষে মানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছিস একটা দাগ রেখে যা। ভারতের উত্থানে কিছু না কিছু ভূমিকা গ্রহণ কর। অনেক বাজে সময় নষ্ট করেছিস, আর নয়। এখন সময় এসে গেছে। মহাজাগরণ আসছে। একে আর কেউ রুখতে পারবে না। যে অন্ধ সেই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, যে বধির সেই শুধু শুনতে পাচ্ছে না, যে বিকৃত মস্তিষ্ক সেই শুধু বুঝতে পারছে না ভারত জননী বিপুল বেগে জাগ্রত হচ্ছেন।

দেশের পরিস্থিতি মানুষকে অস্থির তোলপাড় করে দিচ্ছে। আদর্শের নামে ভণ্ডামী আর তারা সহ্য করতে রাজী নয়। প্রচলিত ভ্রান্ত আদর্শগুলোকে পরিত্যাগ করে মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য মানুষ দলে দলে এগিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছিস না দেশের জন্য মন্দিরের জন্য মানুষ আত্মদানে প্রস্তুত। জড়বাদ ভোগবাদ নিজে নিজেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন মনুষ্যত্বের যুগ মানে হিন্দুযুগ আসছে। মহা রজো-গুণের যুগ। অন্য সব উৎপাত এখন ভেসে যাবে। জান লড়িয়ে দিয়ে দেশের জন্য কাজ করে যা। হিন্দুত্বের জন্য জীবনপণ কর। আর দিনরাত মনে মনে বল্ ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল্ মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, মুচি, মেথর, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ, আমার রক্ত। ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। ভারতবর্ষ আমার মা। ভারতমাতাকে জগন্মাতারূপে প্রতিষ্ঠাই আমার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন, সাধনা। বল্, মা আমার দুর্বলতা দূর করো। আমার কাপুরুষতা, নীচতা, স্বার্থপরতা দূর করো। মা জগদম্বা আমায় মানুষ করো।